ইশরাত জাহান চার্জশিট

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

"আইবি-র কর্মকাণ্ডকে কি সিবিআই-এর প্রকাশ্যে আনা উচিত"-এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২০১৩-র ৪ জুন মাসে আমি বিশদে মন্তব্য করেছিলাম। সীমান্তপারের সন্ত্রাস ও স্থানীয় যোগসাজশ ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। ভারতকে অবিরাম চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে জেহাদি থেকে মাওবাদী সন্ত্রাস। এই চ্যালেঞ্জকে কার্যকর ভাবে মোকাবিলা করতে পারে গোয়েন্দা তৎপরতা ও পাল্টা জবাব। এই কাজে তথ্যসংগ্রহ ও আদানপ্রদান, আড়ি পাতা, অর্থের টোপ দিয়ে গোপন তথ্য ও নাশকতার নকশা জানা এবং হামলার আগেই তা বানচাল করা খুবই জরুরি বিষয়। দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে অত্যন্ত গোপনে এক কাজ করতে হয়। অভিযান চালাতে হয় গোপনে এবং কখনও তা প্রকাশ্যে কবুল করা হয় না। আইনি অনুমোদন ছাড়াই এরকম বহু অপারেশন চালানো হয়, কারণ সরকারের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি অনুযায়ী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করে। জনগণ ও জাতীয় স্বার্থেই একাজ করা হয়। আশা করা যায়, আমাদের গণতন্ত্র পরিণত এবং এ ধরনের অপারেশন আইনের অন্তর্ভুক্ত ও সংসদের খতিয়ে দেখার বিষয় করা করা যেতে পারে।

জঙ্গি ছকের কার্যকলাপের সঙ্গে ইশরাত জাহানের জড়িত থাকার বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থারা তথ্য পেয়েছিল। তথ্য যাচাই করে তা বিনিময় করা হয়। তাদের ছক বানচাল করে দেওয়া হয়। ইশরাত লস্কর-ই তৈবার (এলইইটি) সদস্য ছিল এবং তা প্রমাণিত হয় লাহোর থেকে প্রকাশিত *ঘাঝওয়া টাইমস*-এ প্রকাশিত জামাত-উদ-দাওয়ার দাবিতে। জেইউডি দাবি জানায়, তাদের সদস্য ইশরাতকে হত্যা করা হয়েছে। পরে ডেভিড হেডলি এফবিআই ও এনআইএ-র জেরায় স্বীকার করে এই অপারেশনের ঘটনা। আইবি-র অনুসন্ধানের সময় ভারতে মার্কিন দূতাবাসের আইনি কর্মকর্তা এর সপক্ষে তথ্যপ্রমাণ দেন।

ইশরাত জাহান ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে যখন সংঘর্ষ হয় তখন দিল্লিতে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায়। গুজরাত হাই কোর্টে ইশরাত জাহানের বাবা-মায়ের আনা এক জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার সুনির্দিষ্ট ভাবে জানায়, ইশরাত একজন এলটিই সদস্য ছিল। ৫ই জুন, ২০০৪-এ প্রকৃতই সংঘর্ষ হয়েছিল। তখন স্বরাষ্টমন্ত্রী ছিলেন শিবরাজ পাতিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বদলের সঙ্গে সরকারের অবস্থানও বদল হয়। স্বরাষ্টমন্ত্রী পি চিদম্বরমের অধীনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই সংঘর্ষ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

অবস্থানও বদল হয়। স্বরাষ্টমন্ত্রী পি চিদম্বরমের অধীনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই সংঘর্ষ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। আবেদনকারীর পক্ষাবলম্বন করে তদন্ত শুরু করে। দিল্লির রাজনৈতিক নেতৃত্ব আশা করেছিল, তাদের অন্য সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এই তদন্তের মাধ্যমে গুজরাতের ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের জড়ানো সম্ভব হবে। আদালতের নির্দেশে সিট তদন্ত করার পর সিবিআইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তদন্তকারী দলের সহয়তাকারীদের মধ্যে আবেদনকারী ইশরাতের বাবা-মায়ের পছন্দ করা এক অফিসারও ছিলেন। সিট-এর তিন অফিসারের মধ্যে একজন ছিলেন আবেদনকারীদের পছন্দসই। এফআইআর-এ অভিযুক্ত গুজরাতের অনেক পুলিস কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা চেষ্টা হয়। ৯০ দিনের মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়নি। সংঘর্ষে মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকলেও কয়েকজন পুলিসকর্মী মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং চার্জশিটে তাঁদের নাম রাখা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তাঁদেরই দেওয়া বিবৃতি তাঁদের বিরুদ্ধে যায় এবং তাঁরা অভিযুক্ত নয়, রাজসাক্ষীও নয়, তাঁরা শুধুমাত্র সাক্ষী। পেশ করা প্রথম ও দ্বিতীয় চার্জশিটে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি আইনি ধারার বাইরে। সিআরপিসির ১৬৪ ধারায় এই সব সাক্ষীদের জবানবন্দি নেওয়া হয়, আমেদাবাদে নয়। একজন অভিযুক্ত কখনই সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারে না। সে একমাত্র রাজসাক্ষী হতে পারে। প্রকৃত সংঘর্ষের সময় উপস্থিত থাকলেও তাঁদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা খুব সহজে অন্যদের দোষারোপ করতে পারবেন যাঁরা ঘটনার সময় আদপেই হাজির ছিলেন না।

গুজরাতের রাজনৈতিক নেতাদের জড়ানোর এক দুর্বল প্রচেষ্টা করা হয়। সাদা ও কালো ভালুক মিশিয়ে সাজানো হয় ঘটনা। কিন্তু তা যথেষ্ট প্রমাণ গ্রাহ্য হ.য়নি। এখন ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে আইবি-র বিরুদ্ধে। যাঁরা প্রমাণ সংগ্রহ, নাশকতা রোখা ও অভিযুক্তদের জেরা করার দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নিহতদের জঙ্গি চিহ্নিত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আদালতে দুটো চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে।

ইউপিএ-১ ক্ষমতায় থাকাকালীন এই সংঘর্ষ হয়েছিল। গুজরাতের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ মেলেনি। গোয়েন্দা ব্যুরোর এই গোপন অভিযান অপরাধ আইনের তদন্তের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই অপরাধ আইনের মামলার শুনানিতে আইবি-র তথ্য সংগ্রহের সূত্র, তথ্যের সত্যতা, তথ্যের আদানপ্রদান, নাশকতা বানচালের পদ্ধতি, ক্ষতিগ্রস্তদের জেরা ও নাশকতা ভেস্তে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সহাযোগী সংস্থার নামও বিচার্য বিষয় হয়ে উঠবে। ২০০৯-এ প্রাজ্ঞ তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ-কে জড়ানোর জন্য এই অপারেশনের পরিকল্পনা করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষের দায় ইউপিএ সরকারের সংস্থা আইবি-র উপর চাপানোর পথ ধরেন। সংঘর্ষের প্রকৃতি নির্ধারণ হতে পারে এক মাত্র পারদর্শী আদালতে। কিন্তু গোপন অভিযান চালানোর ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থার যা ক্ষতিসাধন হয়েছে তা অপূরণীয়। ৪ জুন, ২০১৩-র এক নিবন্ধে আমি লিখেছিলাম, শেষ হাসি হাসবে পাকিস্তান ও এলটিই। অদূরদর্শী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরকারি

লিখেছিলাম, শেষ হাসি হাসবে পাকিস্তান ও এলটিই। অদূরদর্শী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরকারি সংস্থাকে ধ্বংস করার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি। প্রয়োজনে ভারতের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে গুজরাত সরকারকে হেনস্থা করো-- কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট"।